

বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব

অপার্থিব

নৈতিকতা যে মানব দেহের অন্তর্নিহিত কোন ভৌত বা বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ জনিত নয়, বরং তা দেহ বহির্ভূত বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবিহীন কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত, এই ধারণা অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল। অনেক বিজ্ঞান সচেতন উদার বা মুক্তমনা মানুষও এই ধারণা পোষণ করে থাকেন। প্রেম, মমত্ববোধ, ও নৈতিকতার মত মানবিক গুণাবলীকে তাঁরা অত্যন্ত মহান ও “স্বর্গীয়” বলে মনে করেন, যা অচেতন, যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক বিধিসমূহের দ্বারা ব্যাখ্যা করলে এই মহান গুণাবলীর অবমাননা করা হয় ও মানুষকে একটা যন্ত্রে পর্যবসিত করা হয়। কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে চিন্তা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের এই ধারণা আত্মার উপর তাঁদের অবচেতন বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত বহন করে। কারণ মানুষের স্বভাব, অনুভূতি, আবেগ, মূল্যবোধ ইত্যাদির কারণেই আত্মার ধারণার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক কারণ (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ) এর দ্বারা মানুষ তার নিজের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে না পেরেই আত্মার ধারণার উদ্ভাবন করেছে অতীতে। মানুষ যন্ত্র নয় এটা জোর দিয়ে বলার অর্থই হোল আত্মায় বিশ্বাস। মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি হোল, কোন ঘটনার বা কার্যের প্রাকৃতিক কারণ বা ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলে এক অপ্ৰাকৃতিক সত্তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে এই অপ্ৰাকৃতিক সত্তার কারণেই যে ঘটনাটা ঘটেছে এই “ব্যাখ্যা” দেয়া। কিন্তু দর্শন বা যুক্তিশাস্ত্রের “ক খ” যারা জানেন তাঁরা বা যুক্তিবিজ্ঞান সম্পন্ন যে কেউই স্বীকার করবেন যে এটা কোন ব্যাখ্যাই নয়। বিবর্তন বিজ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই এই মানবিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলির (সঠিকভাবে বললে এই গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবের) ব্যাখ্যা দেওয়া। নৈতিকতা ও অন্যান্য মানবিক মূল্যবোধের উৎসের ভিত্তি যে প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সূত্রই তার সমর্থনে এখন জোরাল সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রই বিবর্তন প্রক্রিয়ার পেছনে কাজ করে আর তারই পরিণতিতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, যা মানুষ সহ সব প্রজাতিকে বিবর্তনের নির্বাচন চাপের মুখে উদ্ভর্তন ও বংশাণু সঞ্চালনে সহায়তা করে। এই সব জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে জটিলটি হল মস্তিষ্ক। লক্ষকোটি োয়ুকোষ আর সংযোগ বর্তনীর দ্বারা গঠিত মস্তিষ্ক হল জটিল তন্ত্রের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মস্তিষ্ক একদিনে গড়ে উঠেনি। লক্ষ লক্ষ বছরে বিবর্তনের পরিণতিতে ক্রমাগতই আজকের এই জটিল রূপ নিয়েছে মস্তিষ্ক। বিবর্তনের ধারাই হল ধাপে ধাপে সরল থেকে জটিলের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যান্য সব জটিল তন্ত্রের মত মস্তিষ্কও বিকাশমান ধর্ম প্রদর্শন করে। মস্তিষ্ক অতি জটিল হওয়ায় তার বিকাশমান ধর্ম ও অভিনব ও অনন্য। আবেগ, অনুভূতি, নৈতিকমূল্যবোধ ইত্যাদি সবই মস্তিষ্কের বিকাশমান ধর্ম। প্রাকৃতিক নির্বাচনের দরুন যে বিকাশমান ধর্ম গুলো উদ্ভর্তন ও বংশাণু সঞ্চালনে সহায়ক সেগুলিই শুধু টিকে থাকে সময়ের বিবর্তনে। এই টিকে থাকাকাটা পারিসাংখ্যিক বা গড় অর্থে (সংখ্যা ও সময় উভয়ের ভিত্তিতেই)। মানুষ প্রজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নৈতিক মূল্যবোধের তাড়না অনুভব করে। যারা করেনা তারা সংখ্যালঘু। তা নাহলে মানব প্রজাতি অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। এই তাড়না আসে বিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণেই। কোন দৈব বা অতীন্দ্রীয় কারণে নয়।

নৈতিকতার উদ্ভব ও বিবর্তন হয় মস্তিষ্কের সাথে পরিবেশ ও অন্য মস্তিষ্কের মিথস্ক্রিয়ার দরুন মস্তিষ্কেরই বিবর্তনের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে পুরো সভ্যতা বা সংস্কৃতির এরই সৃষ্টি। অনেকেই নৈতিকতার উৎস বলতে সভ্যতা বা সংস্কৃতিকেই চিহ্নিত করেন, যেন এখানেই তার শুরু বা মূল। সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে তাঁরা এক মৌলিক সত্তা হিসেবে দেখেন। সভ্যতা বা সংস্কৃতি নিজেই যে (মস্তিষ্কের)বিবর্তনের ফল, যার এক প্রকাশ হল নৈতিকতা, সেটা তাঁরা উপলব্ধি করেন না। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক ডোনাল্ড ক্যামেরন তাঁর লেখা “জীবনের উদ্দেশ্য” বই এর সংক্ষিপ্তসার অংশে বলেন :

“একটা বহুল প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে অর্থাৎ বংশাণুর বিবর্তনের মাধ্যমে লব্ধ মূল্যবোধগুলির বাড়তি আতিরিক্ত সব মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির এক বিকাশমান ধর্মের কারণে, আর এই সংস্কৃতিলব্ধ মূল্যবোধগুলি জন্মগতভাবে লব্ধ অধিকাংশ মূল্যবোধগুলির স্থান নিয়ে নেয়। কিন্তু এই ধারণার সমর্থনে কোন যুক্তি নেই। এই ধারণাকে আমাদের আর এক আত্মশ্লাঘার উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, যার দরুন আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে অন্য প্রাণীর থেকে আমাদের পার্থক্যটা শুধু পরিমাণগত নয়, বরং গুণগতও। প্রাকৃতিক নির্বাচন কেমন করে জন্মগতভাবে লব্ধ মূল্যবোধের তথ্যটিকে মানুষের মস্তিষ্কে প্রোগ্রাম করে দেয় সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা বোঝা কষ্টকর যে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে সংক্রমিত তথ্য কি করে জন্মলব্ধ মূল্যবোধের অতিরিক্ত নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্যই আমরা সংস্কৃতির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে নূতন মূল্যবোধ সংগঠিত করি। কিন্তু এই নূতন মূল্যবোধগুলি মস্তিষ্কেই সৃষ্ট, এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়।”

অর্থাৎ ক্যামেরন বলতে চাইছেন যে মস্তিষ্ক করে সৃষ্টি, আর সংস্কৃতি করে সেই সৃষ্টিকে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে স্থানান্তর। বা ঘুরিয়ে বলা যায় যে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে মূল্যবোধের এই সংক্রমণকেই বলা হয় সংস্কৃতি। কাজেই বলা যায় যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রবৃত্তি, যা কিনা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মে উচিত অনুচিতের ধারণার জন্ম দেয় তা পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মেরই পরিণতিতে বিবর্তনের দ্বারা মস্তিষ্কের মাধ্যমে সৃষ্ট। নৈতিকতার আসন্ন কারণ সংস্কৃতি বটে, তবে চূড়ান্ত কারণ পদার্থ বিজ্ঞানের বিধিসমূহ। এটাত এক সাধারণ যুক্তির কথা যে মানুষের মস্তিষ্ক(অর্থাৎ মন) যদি পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মের ফলে সৃষ্ট, তাহলে নৈতিকতা, যা আবার মস্তিষ্কেই সৃষ্ট, সেটাও পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রেরই ফল। নৈতিকতা পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মেই প্রচ্ছন্ন আছে(জটিল তত্ত্বের জন্ম)। বিবর্তনের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও নৈতিকতার আভাস পাওয়া যায়। যেহেতু তাদের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের মত অত জটিল নয়, তাই তাদের নৈতিকতাও অতটা উন্নত ও জটিল নয়। নৈতিকতার এই প্রকৃতিক নিয়মের দ্বারা সৃষ্টির কথা সমাজজীববিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইলসন বলেছেন তাঁর “নৈতিকতার জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি” নামক প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে উচিতের অনুভূতি জড়প্রক্রিয়ার একটি উৎপাদ কি ভাবে বিবর্তন নৈতিক প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে? এর ব্যাখ্যায় এডওয়ার্ড উইলসন তাঁর উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন :

“ধরে নেই সহযোগিতা করা বা দলত্যাগ করার প্রবৃত্তি জন্মগত। কেউ বেশী সহযোগিতাপ্রবণ, অন্যেরা কম। এই ব্যাপারে নৈতিকতার প্রবণতা অন্যান্য সব মানসিক প্রবণতার মতই। যেসব প্রবৃত্তি জন্মগত বলে আমাদের জানা তার মধ্যে যেগুলি নৈতিক প্রবণতার সবচেয়ে কাছাকাছি সেগুলি হচ্ছে অন্যের কষ্টের প্রতি

সহমর্মিতা, শিশু ও তার পরিচর্যাকারীর মধ্যকার আসক্তির কতগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া। নৈতিক প্রবণতার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তিযোগ্যতার সংগে যোগ করুন সহযোগিতাপ্রবণ মানুষের দীর্ঘায়ু হওয়ার ও অধিকতর সন্ততি রেখে যাওয়ার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ। এই যুক্তিতে বিবর্তনের ঐতিহাসিক পথ ধরে এগুলো দেখা যাবে যে যেসকল বংশাণু মানুষকে সহযোগিতাপ্রবণ করে সেই বংশাণুগুলিই মানব প্রজাতিতে সামগ্রিকভাবে অধিকতর আধিপত্য বা প্রাধান্য বিস্তার করবে।

এই প্রক্রিয়া কয়েক হাজার প্রজন্ম ধরে পুনরাবৃত্ত হতে থাকলে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে নৈতিক অনুভূতির সৃষ্টি করবে। কিছু মনোবিচারপ্রশ্ন (যদি সেরকম কিছু থেকে থাকে) ছাড়া প্রত্যেক মানুষই বিভিন্নভাবে এই নৈতিক অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করে বিবেক, আত্মসম্মান, অনুশোচনা, সহমর্মিতা, লজ্জা, বিনয়, নৈতিকতার প্রতি আঘাত ইত্যাদি রূপে। এই প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে সেই সব প্রথার দিকে পক্ষপাতের সাথে পরিচালিত করে যেগুলো সার্বজনীন নৈতিক আচরণের সূত্র যেমন সম্মান, দেশপ্রেম, পরার্থতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, করুণা ও প্রায়শ্চিত্যকে প্রকাশ করে।”

নৈতিকতার বিবর্তনের আরও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় গণিতের এক শাখা ক্রীড়াতে। এর একটি সুপরিচিত উদাহরণ হল বন্দীর উভয়সংকট। নীচে সংক্ষেপে এর বিবরণ দেয়া হলঃ

দুই বন্দী, ক ও খ জেলের দুই পৃথক সেলে বন্দী হয়ে আছে। এদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের কোন উপায় নেই। অভিশংসক তাদের উভয়কেই একটা চুক্তির প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি হল -

- ১) যদি কেউ স্বীকার করে যে তারা উভয়ই অপরাধী, কিন্তু অপরাধ তা অস্বীকার করে, তাহলে সে মুক্তি পাবে এবং অপরাধ ৫ বছরের কারাদন্ড পাবে।
- ২) উভয়ই যদি অপরাধ অস্বীকার করে, তাহলে উভয় দু বছরের কারাদন্ড পাবে।
- ৩) উভয়ই যদি অপরাধ স্বীকার করে, তাহলে উভয় ৪ বছরের কারাদন্ড পাবে।

দেখা যাচ্ছে, কেউ যদি অপরাধ স্বীকার করে তাহলে সে হয় মুক্তি অর্থাৎ ০ বছরের কারাদন্ড পাবে (১ নং ক্ষেত্রে) নতুবা ৪ বছরের কারাদন্ড পাবে (৩ নং ক্ষেত্রে)। কেউ যদি অপরাধ অস্বীকার করে তাহলে হয় সে দু বছরের কারাদন্ড পাবে (২ নং ক্ষেত্রে) নতুবা ৫ বছরের কারাদন্ড পাবে (১ নং ক্ষেত্রে)। কাজেই প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকার ওরার চেয়ে স্বীকার করা অধিকতর পুরস্কার বয়ে নিয়ে আসবে (০ বা ৪ বছরের কারাদন্ড অবশ্যই ২ বা ৫ বছর কারাদন্ডের চেয়ে শ্রেয়)। এখন যদি উভয়ই যুক্তিবান ও স্বার্থপর হয় তাহলে উভয়ই অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু পরিণামে তারা উভয়ই ৪ বছরের কারাদন্ড পাবে (৩ নং ক্ষেত্র), যা কিনা উভয়েরই অপরাধ অস্বীকার করার পরিণতির (২ নং ক্ষেত্র) চেয়েও খারাপ। কাজেই তাদের যুক্তিজ্ঞান ও স্বার্থপর চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত পরিণামে তাদের নিজেদের যুক্তিকেই ভুল প্রমাণ করল! এই বন্দীর উভয়সংকটের উদাহরণ যদি অনেকবার পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং একই সাথে যদি তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় তাহলে প্রথম

দিকে উভয়ই অপরাধ স্বীকার করবে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাদের মধ্যে পরীক্ষণ ও ভ্রমসংশোধনের এর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করার এক প্রবণতার জন্ম হবে এবং তারা সহযোগিতার এক নৈতিক আচরণ সূত্র উদ্ভাবন করবে যা বলবে “তোমরা কখনই স্বীকার করিবে না”। অপরাধ চক্রের মধ্যেও এই সহযোগিতার সূত্র পরিলক্ষিত হয় যার দরুন তারা একে অপরকে ধরিয়ে দেয় না। বিবর্তন এভাবেই কাজ করে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কাজ করে বিবর্তন আদিমকালের উপজাতি হতে আধুনিক মানুষের মধ্যে এক নৈতিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছে। এই নৈতিক চেতনা কোন অতীন্দ্রীয় শক্তির দ্বারা মস্তিষ্কে রোপিত হয় নি, এটা মস্তিষ্কের একটা হার্ডওয়্যার্ড প্রবৃত্তি। এই হার্ডওয়্যার্ড প্রবৃত্তি মানুষের একচেটিয়া নয়। আগেও উল্লেখ করেছি নিম্ন প্রাণীদের মাঝেও সরল নৈতিকতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন নেকড়ে বাঘ গোত্রের মধ্যে। তাদের মধ্যে আনুগত্য, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি দেখা যায়। এক শ্রেণীর রক্তপায়ী বাহুড়দের মধ্যেও পরোপকারিতা দেখা যায়, যেখানে অসুস্থ বাহুড়কে প্রতিবেশী বাহুড় গরুর শরীর থেকে পান করা রক্ত দান করতে দেখা গেছে, কারণ প্রবৃত্তিপূর্ণভাবে দাতা বাহুড় জানে তারও একদিন প্রয়োজন হতে পারে এই সাহায্যের।

যে সকল প্রবৃত্তি উদ্বর্তনের সহায়ক বিবর্তনী জীববিজ্ঞানীরা সেগুলিকে উপযোজনীয় আর উদ্বর্তন পরিপন্থী প্রবৃত্তিকে প্রতি-উপযোজনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিছু প্রবৃত্তি উদ্বর্তনের সহায়কও নয় আবার উদ্বর্তন পরিপন্থীও নয়। এরা উদ্বর্তন নিরপেক্ষ বা উদাসীন। বিবর্তন (বিবর্তন মনোবিজ্ঞান সঠিক অর্থে) যে শুধু নৈতিক প্রবৃত্তির মত উপযোজনীয় প্রবৃত্তির উদ্ভবের ব্যাখ্যা দেয় তা নয়, অনৈতিক (যা উদ্বর্তন পরিপন্থী বা উদ্বর্তন নিরপেক্ষ হতে পারে) প্রবৃত্তি সৃষ্টির ব্যাখ্যাও দেয়। বাইবেলে যব নামক অধ্যায়ে যব কে ইশ্বরের কাছে এই ফরিয়াদ করতে দেখা যায় যে কেন তাকে ইশ্বর অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে ফেলেছেন, সে তো কখনও কোন অপরাধ বা অন্যায় করেনি। এ কেমন বিচার ইশ্বরের, যব জানতে চায় ইশ্বরের কাছে। কিন্তু ইশ্বর যব এর এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেন নি। কিন্তু বিবর্তনী জীববিজ্ঞানের সৌজন্যে এখন এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। এই লক্ষ্যে নীতিজ্ঞানের জীববৈজ্ঞানিক উৎস নামে অনেক বই ও গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হল কেন মন্দ বা নীতিহীনতার সৃষ্টি? একটা উদাহরণের মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে বিবর্তনও অনেকটা সাধারণ মানুষের মতই বুদ্ধি বা যুক্তিকে কাজে না লাগিয়ে পরখ ও ভুল ভ্রান্তির মাধ্যমে সবচেয়ে সহজে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেষ্টা করে। স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য হল উদ্বর্তন ও পরবর্তী প্রজন্মে বংশাণু হস্তান্তর করণ। কোন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সক্রিয় যোদ্ধাদের সনাক্ত করে আলাদা করে ধ্বংস করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনেক হিসাব নিকাশ, তথ্য সংগ্রহ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। এর চেয়ে অনেক সহজে এ কাজ করা যায় নির্বিচারে সবাইকে ধ্বংস করে। তাতে শত্রু যোদ্ধাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। যদিও এর ফলে অনেক নিরীহ বেসামরিক লোক নিহত হয়। কিন্তু যোদ্ধারা বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার প্রতি উদাসীন, এতে তারা খুশীও নয়, দুঃখিত ও নয়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল শত্রু যোদ্ধাদের ধ্বংস করা। ইরাকে মার্কিন বাহিনীর বোমাবর্ষণ এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মূল লক্ষ্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মূল লক্ষ্য নয় যারা তাদেরও অনিবার্য ধ্বংসকে যুদ্ধের ভাষায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াজনিত ক্ষতি বলা হয়। অনৈতিকতা বা নীতিহীনতা বিবর্তনের এক অনিবার্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াজনিত ক্ষতি। কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আবার ক্ষতি বা ধ্বংস নাও করতে পারে। বিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনেকটা সেরকম ঘটে। বিবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল উদ্বর্তন ও বংশাণু সঞ্চারণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়ার কিছু অপ্রত্যাশিত উপজাত উৎপন্ন হতে পারে। বিবর্তনের ভাষায় এগুলিকে স্প্যান্ডেল বলা হয়। ইমারতের ছাদের ধনুকাকৃতি খিলান তৈরীর সময় ত্রিকোণাকৃতি যে অপ্রয়োজনীয় অংশ অনিবার্যভাবে তৈরী হয়ে যায় তাকেই স্থাপত্যবিদ্যায় স্প্যান্ডেল বলা হয়।

বিবর্তনের এই অনৈতিক প্রবৃত্তির স্প্যাঙ্কেলের একটি উদাহরণ হল ধর্ষণ। এই প্রবৃত্তি যে এখনও টিকে আছে তার কারণ এটা উপজোযন-পরিপহী নয়। বিবর্তনের শক্তিসমূহের আমাদের মত নৈতিক চেতনা নেই, যদিও আমরা বিবর্তনেরই সৃষ্টি। বিবর্তন অন্ধ। সে শুধু জানে কিভাবে উদ্বর্তন ও বংশাণু সংরক্ষণ ও সঞ্চারণ করা যায় যে কোন উপায়ে। ধর্ষণ শুধু যে উপজোযন-পরিপহী নয় তাই নয়, বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীদের মতে বিবর্তনের আদিম পর্যায়ে উপজোযন সহায়কও হয়ত ছিল। বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানী থর্নবুল আর নৃতত্ত্ববিদ পামার এর লেখা বই “ধর্ষণের প্রাকৃতিক ইতিহাস” এর মূল বক্তব্যই হল অতীতে ধর্ষণের এই উপজোযন সহায়তাকারী ভূমিকা। আর এই মূল বক্তব্যটি হল ধর্ষণ একটি বংশাণুগতভাবে সৃষ্ট বিবর্তনী কৌশল যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তিকে আছে এটা এক প্রকার যৌন নির্বাচন - একটা সফল প্রজনন কৌশল। স্বভাবতই থর্নবুল আর পামার ভুল বোঝাবুঝির স্বীকার হন তাঁরা যে ধর্ষণকে সমর্থন বা ক্ষমা করছেন এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। কিন্তু তাঁরা এর কোনটাই করেন নি। করেছেন এটা ভাবলে তা হবে প্রাকৃতিক হেতুদোষের এক উদাহরণ। যে হেতুদোষের কারণে প্রকৃতিতে যাকিছুই ঘটতে দেখা যায় তাই ঘটা উচিত বলে মনে করা। আসলে তা নয়। “হয়” কে “হওয়া উচিত” এ উন্নীত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। থর্নবুল আর পামার শুধু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলেন ধর্ষণের মত এক নিন্দনীয় আচরণ কিভাবে এখনও টিকে আছে তার বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা দেয়ার। জীববিজ্ঞানী ম্যাট রিডলীও তাঁর “গুণের উৎস” বইতে একই কথা বলেছেন - ধর্ষণ অতীতে বিবর্তনের জন্য উপযোজনীয় ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে মন্দ প্রবৃত্তি গুলো বিবর্তনের এক অনিবার্য উপজাত সৃষ্ট হয়ে টিকে আছে। এরকম আর একটি মন্দ প্রবৃত্তি হল মিথ্যা কথন। পদার্থবিদ হাইন্য পেগেলস তাঁর “যুক্তির স্বপ্ন” বইয়ের ৩৩০ পৃষ্ঠায় এটা সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন:

“জটিলতার নতুন বিজ্ঞান ও কম্পিউটার মডেলিং এর দ্বারা প্রাপ্ত জগৎ সম্পর্কে নতুন ধ্যান ধারণা আমাদেরকে আমাদের মূল্যবোধ সম্পর্কে এমন কিছু শেখাতে পারে যা আমরা আগে কখনই জানতাম না। বিজ্ঞান নৈতিক বিরোধের সুরাহা না করতে পারে, কিন্তু ঐ বিরোধ নিয়ে যে বিতর্ক, বিজ্ঞান সেটাকে এক অভ্রান্ত অবয়ব বা কাঠামো দিতে পারে। একটা উদাহরণ নেয়া যাক যেমন মিথ্যা বলা। আমরা সত্যবলাকে একটা পুণ্য বলে গণ্য করি আর মিথ্যা বলাকে পাপ গণ্য করি। কিন্তু সবাই যদি সর্বদা সত্য কথা বলে, যার দরুন যে কাউকেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়, তাহলে কোন একজন মিথ্যা বললে তার বিপুলভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু এই সম্ভাবনা সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য সহায়ক নয়। অপরদিকে যে সমাজে সবাই সর্বদা মিথ্যা বলে, সেই সমাজও বেশিদিন স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না এবং একসময় ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সবচেয়ে স্থিতাবস্থার দশা হল যখন সবাই অধিকাংশ সময় সত্য বলে কিন্তু মাঝে মধ্যে মিথ্যা বলে, যা বাস্তব জগতে দেখা যায়। এক অর্থে বলা যায় যে আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তারাই আমাদের বাকি সবাইকে সত্যবাদী ও সতর্ক থাকতে সহায়তা বা বাধ্য করে। মিথ্যাকথনের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমরা কেন মিথ্যা বলি সেটা বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে”

ক্রীড়াতে এইরকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে সমর্থন দেয়। মূলত তা সেই প্রাচীণ বিজ্ঞোক্তিকেই সমর্থন করে যা বলে, শুভ এর জন্যই মন্দের প্রয়োজন। আলোর জন্যই অন্ধকারের প্রয়োজন। সম্পূর্ণ মন্দহীন এক আদর্শ জগৎ অলীক কল্পনায় বিরাজমান, বাস্তবে এটা কখনই ঘটবেনা।

পরিশেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাক। অনৈতিকতা বা মন্দ থাকবেই বলার অর্থ এই নয় যে তাকে সমর্থন করা বা নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা বা না পোষণ করা। অনেকে এটা ভাবতে পারেন যে ধর্মীয় বিধানের শাস্তির ভয় না থাকলে অর্থাৎ নৈতিকতার দৈব উৎসে বিশ্বাস না করলে নৈতিকতার উপর পরম কোন আস্থা বা বিশ্বাস আসতে পারে না। এর উত্তরে বলব বিবর্তন যেমন মন্দ বা অনৈতিকতার উপস্থিতি নিশ্চিত করে, তেমনি বিবর্তন এটাও নিশ্চিত করে যে অধিকাংশের মনে নৈতিক চেতনার শক্ত ভিত যেন গঠিত হয়। বিবর্তন এটাই নিশ্চিত করে যে গড়ে সমাজের অধিকাংশই যেন অপরাধ বিমুখ হয়, মানুষ প্রজাতির উদ্ভবের লক্ষ্যে। যাঁরা প্রচলিত ঐশ্বরে বিশ্বাস করেন না অন্যান্যদের মত তাঁদের অধিকাংশেরও মনে নৈতিক চেতনার এক অনপনেয় প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। পরলোকে শাস্তির ভয় কে যুক্তির বিচারে অমূলক জেনেও তাঁরা অপরাধ না করার এক জোরাল প্রবৃত্তি অনুভব করেন। অপরাধ করলে লাভবান হবার ও শাস্তি না পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েও শত চেষ্টা করলেও তাঁরা অপরাধ করতে পারবেন না। এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাদের নিবৃত্ত করে। যুক্তি দিয়ে যেমন কোন খাবারের প্রতি অরুচি বা লোভকে পরিবর্তন করা যায় না তেমনি অপরাধ না করার বিবর্তনজনিত প্রবৃত্তিকেও যুক্তি তর্ক দ্বারা জয় করা যায়না। ধর্মে বিশ্বাসী অনেকে বলবেন ঐশ্বরে অবচেতন বিশ্বাসের জন্যই এমনটি হয়। অপরাধবিমুখ অবিশ্বাসী যুক্তিবাদী লোকটি সেটা জানে না। কিন্তু আসল ব্যাপারটি হল বিশ্বাসী লোকটিই নৈতিক মূল্যবোধ এর প্রবৃত্তির কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা না জানায়, (হয়ত তাঁরা বিবর্তন ও পদার্থবিজ্ঞান পড়েন নি বা বোঝেন না বা এগুলোকে নাস্তিকের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেন) এক অপ্রাকৃতিক কারণ দ্বারা এর “ব্যাখ্যার” চেষ্টা করছেন। প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী না হয়েও যে কেউ নীতিবান হতে পারে নিছক প্রাকৃতিক কারণে সেটা তাঁদের অজানা ও সেহেতু অসম্ভব বলে মনে হয় তাঁদের।

অপার্থিব : মুক্তমনার ফোরামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপার্থিব এর সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে ও লেখক হিসেবে। পুরো নাম অপার্থিব জানান, তবে অপার্থিব নামেই লিখে থাকেন। বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, যুক্তিবাদ অধিবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার এই স্নাতক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। ইমেইল : aparthib@yahoo.com